বর্ণবাদ

ইউনিট ৯

ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের নাম বর্ণবাদ। বিশেষ করে বিশ্বের নানা দেশে মানুষের অধিকার হরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এই বর্ণবাদ। তবে হিসেব করে দেখা গেছে আফ্রিকায় ইউরোপের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে আফ্রিকার কালো বর্ণের মানুষরা সবচেয়ে বেশি নিগ্রহের শিকার হয়েছিল। এদিক থেকে চিন্তা করে বর্ণবাদের একটি সহজ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে মনে করা হয়, কালো চামড়ার মানুষদের উপর সাদা চামড়ার মানুষগুলো যে বৈষম্যমূলক আচরণ করে সেটাই বর্ণবাদ। এক্ষেত্রে তারা খেয়াল করে না যে মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের একটি হচ্ছে ত্বক যা যে কারো যে কোনো বর্ণের হতেই পারে। চামড়ায় মেলানিন নামক পদার্থের উপস্থিতি, অনুপস্থিতি কিংবা পরিমাণগত ভিন্নতায় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় সেখানে মানুষ হিসেবে কারও কোনো হাত থাকে না। ফলে গাত্রবর্ণের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণিকরণ একটি বিভ্রান্তিকর ধারণা। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলোর উপর ইউরোপ থেকে যাওয়া সাদা চামড়ার মানুষের বৈষম্যের প্রতিবাদে প্রথম সোচ্চার হতে দেখা যায় সেখানকার মানুষকে। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের মানুষও বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। এক্ষেত্রে মার্টিন লুথার কিং, ফ্রেডারিখ উইলিয়াম দ্য ক্লার্ক, মহাত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা কিংবা ডেসমন্ড টুটুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে অনেকে অন্যায় আচরণ শুরু করেছিলেন যাদের মধ্যে জিম্বাবুয়ের রবার্ট মুগাবে কিংবা উগান্ডার ইদি আমিনের নাম বলা যেতে পারে।

	এ ইউনিটের পাঠে আপনি যা জানতে পারবেন

পাঠ-৯.১ বর্ণবাদের ধারণা

পাঠ-৯.২ বর্ণবাদের পটভূমি

পাঠ-৯.৩ বর্ণবাদের ঐতিহাসিক আবর্তন

পাঠ-৯.৪ বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব

পাঠ-৯.১ বর্ণবাদের ধারণা

কোনো নরগোষ্ঠীর প্রতি ভিন্ন গাত্রবর্ণের অন্য নরগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীর গাত্রবর্ণের বিভিন্নতাজনিত যে বৈষম্যমূলক আচরণ তাকে সাধারণ অর্থে বর্ণবাদ বলা হয়ে থাকে। বর্ধিত পরিসরে বলতে গেলে গাত্রবর্ণের ভিন্নতার কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে কোনো জাতিকে বিপন্ন করা হলে তা বর্ণবাদের আওতায় পড়ে। ইংরেজি রেস থেকে রেসিজম তথা বর্ণবাদ কথাটির উদ্ভব। এক্ষেত্রে মানুষের গাত্রবর্ণ, সামাজিক শ্রেণি, বংশ পরিচয় ও জন্মস্থানের উপর ভিত্তি করে মানুষকে বিভক্ত করে কোনো জাতি বা গোষ্ঠী তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করলে তাকে বর্ণবাদ বলে। এক্ষেত্রে মানুষকে শ্রেণিকরণের মাধ্যমে আলাদা করে সুযোগ সুবিধা বণ্টনের তারতম্য করার চেষ্টা চলে। ফলে নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠী তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে। অন্যদিকে অনেক জাতিগোষ্ঠী তাদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

অ্যাপারথেইড (Apantheid) তথা আলাদাকরণের যে নীতি, তার উপর ভিত্তি করে নিগ্রহের এক নতুন ধারা জন্ম নিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানে সংখ্যলঘু শেতাঙ্গরা দেশ শাসন করতে গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ কালো চামড়ার মানুষকে নিগ্রহের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। বিশেষ করে ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার যে নীতি গ্রহণ করে তা ছিল বিপত্তিকর। এই ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বর্ণবাদে বিশ্বাসী নৃ-বিজ্ঞানীদের পরামর্শ ও ধারণা থেকে। তারা বিশ্বের মানুষকে বিভিন্ন নরগোষ্ঠী যেমন ককেশয়েড, অস্ট্রালয়েড, মঙ্গোলয়েড, নিগ্রয়েড প্রভৃতি বর্ণ তথা রেসে ইড (race) বিভক্ত করেছিলেন। তাদের ধারণায় একটি বিশেষ জৈব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষ অপেক্ষাকৃত কম বা বেশি কর্মক্ষম কিংবা অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছিল। তারা প্রচারের চেষ্টা করেন যে এই জৈবিক বৈশিষ্ট্যের বলেই মানুষ তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞানচর্চা কিংবা সংশ্লিষ্ট নানা ক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে আরোহন করেছিল। অন্যদিকে পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষ তাদের গাত্রবর্ণ তথা জৈবিক কারণজাত বর্ণভেদের কারণেই অকর্মা, অপদার্থ, অলস, অসভ্য, অমার্জিত এবং দাসবৃত্তির যোগ্য বলে মনে করতেন তারা।

নরগোষ্ঠীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে এমন ধারণার উপর ভিত্তি করে নরগোষ্ঠীর বিশুদ্ধতা রক্ষার একটা প্রচেষ্টা চলে। তখন মনে করা হত নিম্নবর্ণের মানুষের দূষিত রক্তের সঙ্গে উন্নত বর্গের মানুষের রক্তের মিশ্রণ সম্ভব নয়। তাদের এই অন্ধ বিশ্বাসের বলি হতে হয়েছিল অনেক দেশের মানুষকে। তারা শুধুমাত্র গাত্রবর্ণের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন মানুষকে তার দেশছাড়া করেছিল। যেমন সাদাদের দেশ থেকে কালোদের বের করে দেয়া হয়েছিল শুধুমাত্র তাদের রক্ত বিশুদ্ধ রাখার নষ্ট অভিপ্রায়েই। একইভাবে অনেক দেশে বসবাসরত মানুষকে গণহারে হত্যা করা হয়েছে। সম্প্রতি মায়ানমারে আদিবাসী রোহিঙ্গাদের উপর চলমান গণহত্যা এই ধরণের বর্ণবাদ প্রতিষ্ঠার একটি ধিকৃত অপপ্রয়াস। শুধুমাত্র গাত্রবর্ণের ভিন্নতার পাশাপাশি ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে আদিবাসী রোহিঙ্গাদের হত্যা করছে মায়ানমারের সামরিক জান্তা। তারা রোহিঙ্গাদের জন্মভূমি থেকে তাদের তাড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিচারে সবাইকে হত্যা করেছে। অন্যদিকে নিজ থেকে বিতাড়িত এসব মানুষ প্রাণরক্ষার দায় নিয়ে এসে অবস্থান করছে বাংলাদেশে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্ণবাদের যে বিস্তার তার পেছনে মূল প্রণোদনা সৃষ্টি করেছিলেন বর্ণবাদী নৃ-বিজ্ঞানীরা। তাদের পাশাপাশি ঐ দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক এবং ইতিহাসবিদরা ইন্ধন যুগিয়েছেন। সেখানে বর্ণবাদী নৃ-বিজ্ঞানীরা একবার বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে একটি বর্ণনা প্রচারের চেষ্টা চালিয়েছেন। পরে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক ও ইতিহাসবিদরা তাদের অতীত সম্পর্কে পক্ষে বিপক্ষে নানা ধরণের মন্তব্য দাঁড় করানোর চেষ্টা চালিয়েছেন। বিশেষ করে একটি দেশের প্রভাবশালী নৃ-বিজ্ঞানীরা যখন কোনো জাতিগোষ্ঠীকে ছোট প্রমাণের চেষ্টা করেছেন সেখানে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে দেখা গেছে ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের। তারা এই জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস নিয়ে নানা নেতিবাচক মন্তব্য তৈরি করেছেন। পাশাপাশি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার নামে ঐ নির্দিষ্ট জাতির অতীত সম্পর্কিত নানা নেতিবাচক বস্তুগত প্রমাণ দাঁড় করানোর চেষ্টাও চলেছে।

এক পর্যায়ে এসে দেখা গেছে নৃ-বিজ্ঞানী, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদ মিলে অতীতের উপর ভিত্তি করে একটি জাতির ভবিষ্যত নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টা যখন উৎকৃষ্ট কিংবা নিকৃষ্ট প্রমাণের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন উক্ত জাতির বিশ্বাস, আদর্শ ও অধিকারের বিষয়টি হয়ে গেছে প্রশ্নবিদ্ধ। কবির কবিতার বিখ্যাত চরণ ‘কালো আর ধলো বাহিরে কেবল

ভেতরে সবার সমান রাঙা'। যে ধারণা মানুষের ভেদাভেদ দূর করে সব মানুষকে সমান বানিয়েছে তা আদতে কতটা বিদ্যমান সেটা প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে বার বার।

বর্ণবাদ শব্দটি দ্বারা মূলত শরীরের রং দ্বারা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে এমন নয়। চামড়ার বর্ণবৈচিত্র্য থেকে বর্ণবাদ সবার অস্তিমজ্জায় গেঁথে আছে। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের মানুষ বর্ণবাদের বিষয়টি পুরোপুরি দূর করতে চায় না। সাদা চামড়া কালো চামড়া নিয়ে সারা পৃথিবীতে এক অদ্ভুত বৈষম্য চালু ছিল একসময়। কালো চামড়ার লোকদের দাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রভু আর ভৃত্যের সম্পর্ক ছিল কেবল গায়ের রংয়ের ওপর ভিত্তি করে। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে উপন্যাস, সিনেমা। যেই মাদিবা তথা নেলসন ম্যান্ডেলা নামটি আজ সবার কাছে পরিচিত। তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন এই বর্ণবাদো বিরুদ্ধে। তার জন্য তাকে কম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি। অদ্ভুত সব বৈষম্যে ভরা এই সমাজটা। এখানে চামড়ার রঙে বৈষম্য, জাতিতে জাতিতে বৈষম্য, গোত্রে গোত্রে বৈষম্য, আকারে বৈষম্য, আর্থিক ক্ষমতায় বৈষম্য এরকম আরও বহু বৈষম্য প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠতে দেখা গেছে।

তবে উইকিপিডিয়া বর্ণবাদের যে সংজ্ঞা দিয়েছে সেখানে বলা হয়েছে, 'বর্ণবাদ সেই দৃষ্টিভঙ্গি, চর্চা এবং ক্রিয়াকলাপ যেখানে বিশ্বাস করা হয় যে মানুষ বৈজ্ঞানিকভাবেই অনেকগুলো গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং একইসাথে বিশ্বাস করা হয় কোন কোন গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর চেয়ে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য উঁচু অথবা নিচু; কিংবা তার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারী অথবা বেশি যোগ্য কিংবা অযোগ্য'। তবে বর্ণবাদের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করাটা কঠিন। কারণ গবেষকদের মধ্যে গোষ্ঠী ধারনাটি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। বর্ণবাদ কখনো গায়ের রং, কখোনো আঞ্চলিকতা আবার কখোনো গোত্র নিয়ে বোঝানো হতে দেখা গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে কাগজে কলমে কিংবা বক্তৃতার কথামালায় দেখা যায় মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। সবাই মুখে মুখে বর্ণ বৈষম্য নেই বলে নিজেদের আধুনিক দাবি করে। তারপরেও প্রায় প্রতিটি দেশের সমাজে এত ভেদাভেদ আর গোত্রে গোত্রে যে হানাহানি তার মূলে রয়েছে বর্ণবাদ। সংবিধান কিংবা সমাজের মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণবাদ নেই, গায়ের রং দিয়ে কাউকে ছোট বা বড় করার সুযোগ নেই। তবুও বর্ণবাদের দীর্ঘ কালো ছায়া আরও দীর্ঘতর হয়ে আছে বিভিন্ন পরিবারের চিন্তায়, সমাজের সিদ্ধান্ত কিংবা টিভির বিজ্ঞাপনে।

ভদ্রলোকের খেলা বলে পরিচিত ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার হাশিম আমলা বারংবার হিংস্র কথার মুখে পড়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারদের অনেকেই কটুক্তি করছে কালোবর্ণের কারণে। ইংল্যান্ডে খেলতে গিয়ে বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হয়েছেন আমাদের দেশের ক্রিকেটাররাও। ভারতের বিখ্যাত স্পিনার হরভজন সিং একবার শাস্তির মুখে পড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার এক খেলোয়াড় অ্যান্ড্রু সাইমন্ডসকে বানর বলার কারণে। পাশাপাশি টিভিতে সারাদিন রং ফর্সা করার ক্রিমের বিজ্ঞাপন প্রচার হতে দেখলে বোঝা যায় বর্ণবাদ কিভাবে টিকে আছে বিশ্বের নানা দেশে। প্রতিটি দেশে সাদা কালো কোন বিভেদ নই থাকলে ত্বকের রং ফর্সা হওয়ার ক্রিমের এত মূল্য থাকত না। মুখে যে যাই বলুক মেয়েকে ফর্সা বানানোর প্রাণান্ত চেষ্টায় থাকেন প্রত্যেক মা বাবা। অনেক ক্ষেত্রে চিন্তাগত দুর্বলতায় মেয়েকে শিক্ষিত করে বড় করে তোলার চেয়ে ফর্সা করাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের কাছে।

পাঠ-৯.২ বর্ণবাদের পটভূমি

ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আফ্রিকায় বর্ণবাদ বিকাশ লাভ করেছিল। অন্যদিকে ১৭ শতকের দিকে দাস প্রথা বিস্তারের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বিস্তার লাভ করেছিল এই বর্ণবাদ। সেখানেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে আফ্রিকা থেকে ধরে নিয়ে আসা মানুষগুলোকে দাস হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছিল। তারা ইউরোপের দাস ব্যবসায়ীদের কাছে ধরা পড়েছিল। তারপর সেই মানুষগুলোকে পশুর মত জাহাজে বোঝাই করে নিয়ে আসা হতে থাকে ইউরোপের উপনিবেশ রয়েছে এমন নানা দেশে। সেখানে তাদের বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দিতে বাধ্য করা হত। একটু খেয়াল করতে দেখা যায় এই আফ্রিকায় বিশ্বের বেশিরভাগ কালো মানুষের বসবাস। আফ্রিকা আবিষ্কারের পরবর্তী এক দশকে তারা সেখানে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। তারা নানাভাবে আফ্রিকার মাত্র ১০ শতাংশ এলাকার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিল। তবে তারা সুযোগ বুঝে আফ্রিকার নানা স্থানে তাদের উপনিবেশ বিস্তার করতে থাকে। তারা সেখান থেকে সম্পদ পাচারের পাশাপাশি কালো বর্ণের মানুষদের ধরে নিয়ে বিশ্বের নানা দেশে বিক্রি করে দিতে থাকে। ১৭ শতকের দিকে সেখানে তাদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর সম্পদ পাচারের পাশাপাশি অগণিত স্থানীয় অধিবাসীকে অপহরণের পর দাস হিসেবে বিক্রি করে দিতে দেখা যায়।

উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে শ্বেতাঙ্গদের আনাগোণা লক্ষ করা যায় দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে। তারা স্থানীয় বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় আস্তে আস্তে আফ্রিকার উপর দখল নিরঙ্কুশ করতে থাকে। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল থাকায় ১৯ শতকের একটা পর্যায়ে এসে আফ্রিকার প্রায় ৯০ শতাংশ ভূমি উপনিবেশের গ্রাসে চলে যায়। প্রথম দিকে পর্তুগিজরা আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তারপর একে একে ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজরা সেখানে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করে। এরা সেখানে প্রথম দিকে নিজেদের খামার গড়ে তোলে। তারপর দাস ব্যবসা শুরু করেছিল। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে কালো বর্ণের মানুষদের ধরে নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্রি করত তারা। তবে এতে করে এই অঞ্চলে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা লুটেরা এবং শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষে আফ্রিকায় তাদের বসতি টিকিয়ে রাখাই শ্বেতাঙ্গদের জন্য কঠিন হয়ে যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের টিকে থাকার জন্য সেখানে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিকল্প ছিল না। তারা এই উদ্দেশ্যে দুটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে। প্রথম দিকে তারা ইউরোপের নানা অঞ্চলের কারাগারে বন্দী দাগী আসামীদের আফ্রিকা গমনের শর্তে মুক্তি দিতে শুরু করে। এই সব আসামীরা কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর আফ্রিকায় গিয়ে সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েদের বিয়ে করে স্থানীভাবে বসবাস করতে থাকে। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের প্রচুর অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ইউরোপ থেকে আফ্রিকায় নিয়ে আসা হয়। তারা সেখানে গিয়ে স্থানীয় ধনী কৃষ্ণাঙ্গদের বিয়ে করে শ্বেতাঙ্গদের বংশ বিস্তার করে। এভাবে এক পর্যায়ে দক্ষিণ আফ্রিকার অনেকগুলো এলাকায় কৃষ্ণাঙ্গদের পাশাপাশি শ্বেতাঙ্গদের জনসংখ্যাও বেড়ে যায় বহুলাংশে।

আফ্রিকার মত এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় আমেরিকাতেও। সেখানে ইউরোপের নানা স্থান থেকে গিয়ে বসতি স্থাপন করে শ্বেতাঙ্গরা। তারা সেখানকার জনসংখ্যা হিসেবে সংখ্যালঘু হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তাদের এই কাজ সহজ করে দেয় বর্ণবাদী নৃ-বিজ্ঞানীরা। তারা নরগোষ্ঠীর ধারণাকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর আরোপের মধ্য দিয়ে শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে। পাশাপাশি আরও নানাদিক থেকে তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের পাশাপাশি কৃষ্ণাঙ্গদের হেয় করতে থাকে। বিশেষ করে আফ্রিকা থেকে ধরে আনা কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের উপর শ্বেতাঙ্গরা তাদের আধিপত্য নিশ্চিত করে। তারা সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিটি দিক থেকে নিগ্রহের শিকার হয়।

১৯১০ সালের ৩১ মে আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শক্তি নতুনভাবে আধিপত্য বিস্তার করে। তারা সেখানে তাদের সুবিধামত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে এদিন প্রথমবারের মত সফলতার মুখ দেখে। তারা এদিন কেপ কলোলি, নাটাল, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট এই চারটি ব্রিটিশ উপনিবেশ মিলিয়ে প্রতিষ্ঠা করে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন। এখানে প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে মনোনীত করা হয় ভাইকাউন্ট গ্লাডস্টেন। এই অঞ্চলের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করা হয় জেনারেল বোথাকে। এরপর ১৯৬০ সালে তারা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তবে ১৯১০-৬০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীর ইউনিয়নে থাকাকালে সেখানে বর্ণবাদ চরম রূপ লাভ করেছিল। এই জঘন্য বর্ণবাদ সেখানে গত শতকের নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন শুরু থেকেই কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের জন্য দুটি আলাদা নীতি

অনুসরণ করে আসছিল। তারা এক্ষেত্রে পৃথকীকরণ ও সমন্বয়করণ নীতির প্রচলন ঘটিয়েছিল। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সেখানে বর্ণবাদের প্রভাব অতটা প্রকট আকার ধারণ করতে পারেনি। তারা সেখানে নানা রকম সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেছিল। সেখানকার একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী দল তথা আফ্রিকান ন্যাশনালিস্ট পার্টি ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করেছিল। বিশেষ করে এই দলটি ক্ষমতায় এসে বর্ণবাদকে সরকারি নীতিতে রূপ দেয়। তারা বর্ণবাদের সমর্থনে সাতটি আইন প্রণয়ন করেছিল। এই আইন সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার হরণের হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়।

আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী সরকার ক্ষমতায় থাকাকালিন যে আইন পাস করেছিল সেখানে জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এই নিবন্ধনের ক্ষেত্রে গাত্রবর্ণ ও গোত্র অনুযায়ী নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। বিশেষত নবজাতকের বর্ণ এবং গোত্র অনুযায়ী নিবন্ধের এই ধারণায় তারা জন্মের পর থেকে নিগ্রহের শিকার হতে থাকে। এরপর ১৯৫০ সালের দিকে পাস করা হয়েছিল আবাসভূমি পৃথকীকরণ আইন। এই বিশেষ আইনের মাধ্যমে সেখানে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের আবাসভূমি পৃথক করা হয়েছিল। মোট জনসংখ্যার ৫ ভাগের বিপরীতে শ্বেতাঙ্গ ছিল ৪ ভাগ। তার পরেও সেখানকার ভূমি বণ্টনের বৈষম্যে তারা মাত্র ১৩ শতাংশ অনুর্বর ভূমির মালিকানা লাভ করেছিল। একইসঙ্গে প্রণয়ন করা হয়েছিল বিশেষ ধরণের পাশ আইন। এ আইনের আওতায় দক্ষিণ আফ্রিকার বেশিরভাগ কৃষ্ণাঙ্গ নর-নারীকে পুলিশের সামনে বিশেষ পাশ দেখিয়ে তবেই চলাচলের অধিকার দেয়া হত। অন্যদিকে বিশেষ নাগরিক আইনের মধ্যে দিয়ে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। তার বাইরে পৃথক সুবিধা আইনের মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বৈষম্যমূলক নানা সুবিধার প্রবর্তন করা হয় যা বঞ্চিত করতে থাকে কৃষ্ণাঙ্গদের। অন্যদিকে অনৈতিক আইনের মাধ্যমে সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বিয়ে কিংবা সব ধরণের যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়।

তবে একসময় বর্ণবৈষম্যে ভরা দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের যে আধিপত্য ছিল এখন কালোদের দাপটে তারাই হয়ে পড়েছে কোণঠাসা। এক সময় কালোদের উপর ধারাবাহিক নির্যাতন করে আসা আফ্রিকা সমাজে সাদাদের কিছু মানুষ টের পাচ্ছে বঞ্চনা কী, সহিংসতা কতটা ভয়াবহ। তাদের অনেকের ভবিষ্যৎও এখন হুমকির মুখে। বিবিসিতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে কালোদের দ্বারা সাদাদের নির্যাতিত হওয়ার চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। সেখানে দেখানো হয়েছিল কালোদের কাছে কিভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে এক সময়ে ক্ষমতায় থাকা প্রতাপশালী সাদারা। রাজনীতি ও গণমাধ্যমে তুলনামূলকভাবে তাদের প্রভাব বেশি থাকলেও ঠিক অপর পিঠেই রয়েছে শ্বেতাঙ্গদের দারিদ্র্যের চিত্র। নানা দিক থেকে স্পষ্ট হয়েছে কিভাবে তারা অবস্থানের দিক দিয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যিই শ্বেতাঙ্গদের কোনো ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সুযোগ আছে কি না।

তবে সাদাদের মধ্যে যারা ভালো অবস্থানে আছে কিংবা যারা দেশটির পরিস্থিতির সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু আফ্রিকান ভাষাভাষী সাদাবর্ণের শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা মোটেও ভালো নয়। তাদের এ দুর্দশার চিত্র কোনো পত্রপত্রিকায় সেভাবে দেখা যায় না কিংবা টেলিভিশনেও প্রচার হয় না। সবাই দক্ষিণ আফ্রিকার অতীত ইতিহাস থেকেই সাদাদের এ নিগ্রহের সূচনা বলে মনে করছে। এক্ষেত্রে সবাই দায়ী করছে সাদাদের অতিরিক্ত আধিপত্যবাদী মনোভাবকে। তাই ২০ বছর আগে দেশটিতে শ্বেতাঙ্গ কৃষকের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। এখন তা অর্ধেকে নেমে এসেছে। বস্তুত অতীতে বর্ণবাদ ব্যবস্থায় শ্বেতাঙ্গরা যেভাবে ফায়দা লুটেছে আজ ক্ষমতাসীন কালোদের দাপটে তাদের ঠিক সেই অবস্থায় পড়তে হয়েছে।

তবে শুধু এই বর্ণবাদ নয় অন্য নানা ক্ষেত্রেও আফ্রিকার সংকটটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আফ্রিকা এখন প্রধান যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি, তার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রগুলোর ব্যর্থ হয়ে যাওয়া, গণতন্ত্র হাতবদলের জটিল প্রক্রিয়া কিংবা জনসংখ্যার সমস্যার পাশাপাশি বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগের প্রকোপ। এসব দেশের নারীরা একেকজন এখনো সাত-আটটি করে সন্তান ধারণ করেন। তাই এসব দেশের জন্য কোটি কোটি ইউরো খরচ করেও স্থিতিশীলতা আনা সম্ভব নয় বলে দাবি করেছেন অনেক পশ্চিমা গবেষক। তবে এ দেশগুলো ধীরে ধীরে এ অবস্থার দিকে পতিত হয়েছে বর্ণবাদের কারণেই। আফ্রিকার দেশগুলো নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন এমন একজন যাকে ইউরোপের নব্য উদারতাবাদের ধারক মনে করা হয়। তিনি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাখোঁ। জার্মানির হামবুর্গে অনুষ্ঠিত জি-২০ সামিটে আফ্রিকার দেশগুলোতে ফ্রান্সের সহায়তা তহবিল না থাকার সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেছিলেন। স্পষ্টতই বর্ণবাদের ঔপনিবেশিক যে মানসিকতা, তারই এক প্রতিফলন ম্যাখোঁর এই বক্তব্য। এক সময়ের উপনিবেশ থেকে শোষণকারী ফ্রান্সের আধুনিক যুগে উত্তোরণের পর উদারবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত ম্যাখোঁর এই বক্তব্যে এক অর্থে অতীতেরই প্রতিফলন লক্ষ করা গেছে। তার এই বক্তব্য থেকে অনেকে মনে করেন এখনকার বিশ্বেও বর্ণবাদ নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

পাঠ-৯.৩ বর্ণবাদের ঐতিহাসিক আবর্তন

দাস ব্যবসা থেকে শুরু করে শ্রমের দিক থেকে নিগ্রহ কিংবা আরও নানা কারণে ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি যুদ্ধ বিগ্রহের জন্ম দিয়েছে বর্ণবাদ। ঔপনিবেশিক যুগের বর্ণবাদ ছিল ইউরোপ থেকে বিশ্বের নানা দেশ দখলকারীদের হাতিয়ার। তারা তাদের দখলদারিত্ব বৈধ প্রমাণের পাশাপাশি সেই হাতিয়ারের ব্যবহারকে সাধারণের চোখে সিদ্ধ করেছে নানাভাবে। বিশেষ করে এর জন্য নানাবিধ যুগোপযোগী ব্যাখ্যাও তারা প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিল তারা। এক্ষেত্রে বর্ণবাদের ব্যাখ্যা হিসেবে কখনও দ্বারা ব্যবহার করেছে ধর্মকে। পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষে কাজে লাগিয়েছে বিজ্ঞানকেও। আব্রাহাম লিংকনকে সবাই গণতন্ত্রের জনক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা অবলুপ্তির নায়ক হিসেবেই জানেন। তবে তিনিও যখন বর্ণবাদের পক্ষে কাজ করেছেন বলে জানা গেছে তখন অনেকে বিস্মিত হন। তাই আমেরিকার দাসপ্রথা বাতিলের পেছনে লিংকনের যে সিদ্ধান্ত তাকে সবাই মানবিক থেকে রাজনৈতিক দিকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে তুলে ধরেছেন। তবে কেউ কেউ দাবি করেছেন লিংকন বর্ণবাদী ছিলেন না। তিনি যে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতেন তার আলোকেই তাকে বিচার করতে হবে, বর্তমানের প্রেক্ষিতে বিচার করলে তার গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবতা বোঝা সম্ভব হবে না। তখনকার উগ্র বর্ণবাদী সমাজের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে গেলে লিংকনের সিদ্ধান্তকেই যথার্থ বলে মনে হতে পারে। ফলে তিনি যে বর্ণবাদ জৈব ভিত্তি থেকে মুক্তি দিয়ে একটি মুক্ত চিন্তার পথ করে দিয়েছেন সেটা বোঝা সম্ভব হবে।

এদিক থেকে ধরতে গেলে ভারতবর্ষের বর্ণবাদের ইতিহাসও অনেকদিনের প্রাচীন। ভারতবর্ষে যেভাবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শুদ্র বিভাজনের মাধ্যমে বৈদিক যুগ থেকে বর্ণবাদ চলে এসেছে তার থেকে মুক্তি মেলেনি এই একুশ শতকে এসেও। তবে ভারতবর্ষে বর্ণবাদের মুখ্য কারণ ছিল সামাজিক মর্যাদা চামড়ার বর্ণ এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। সেদিক থেকে চিন্তা করলে গাত্রবর্ণ দিয়ে বর্ণবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায়। উনিশ শতকের শেষার্ধে এই বর্ণবাদকে দেয়া হয় বৈজ্ঞানিক রূপ। বিবর্তনবাদের জনক খ্যাত চার্লস ডারউইনের চাচাত ভাই বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত ফ্রান্সিস গল্টন এ ধারণাকে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি মনে করেছিলেন মানুষের ক্রমাবনতি ঘটবে। তিনি ইউজেনিক্স নামে একটি নতুন মত প্রচার করতে শুরু করেছিলেন যার মূলকথা হচ্ছে- 'শুধু জৈব বৈশিষ্ট্য নয়, মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও মানসিক গুণাবলিও বংশগতীয়, সুতরাং তা গোত্রে গোত্রে বা বর্ণে বর্ণে আলাদা। সকল বর্ণের মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সমান নয়। এজন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত যৌন নির্বাচন। অর্থাৎ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত বাবা-মা নির্বাচন করা হলে তাদের সন্তান অপেক্ষাকৃত বেশি বুদ্ধিমান হবে এবং এভাবেই মানুষের ক্রমাবনতি ঠেকানো যাবে'। তার হিসেবে যথারীতি উন্নত বর্ণের মানুষের সাথে কোনভাবেই অনুন্নত বর্ণের মানুষের প্রজনন ঘটতে দেয়া যাবে না। আর এক্ষেত্রে তার হিসেবে সাদারা ছিল উন্নত আর কালোদের ধরা হত অনুন্নত।

গ্যাল্টনের বিভিন্ন ধরনের লেখালেখি নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ১৮৬৯ সালে তার কুখ্যাত 'হেরেডিটারি জিনিয়াস' বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তিনি বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী মানুষের সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী বিভিন্ন গোত্রকে বিভক্ত করার একটা চেষ্টাও চালিয়েছেন তিনি। অদ্ভুতভাবে তার গোত্রীয় যোগ্যতার স্কেলটি গিয়ে শেষ হয়েছিল একটি পশুতে। তার হিসেবে এই ক্রমটি ছিল প্রাচীন গ্রিক-ইংরেজ- এশীয়-আফ্রিকান-অস্ট্রেলীয় আদিবাসী-কুকুর পর্যন্ত। এক্ষেত্রে তার হিসেবে বর্ণপ্রথার শেষ স্তর কুকুর। অনেকে ধারণা করেন গল্টন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েই এমনটি ভেবেছিলেন। তিনি মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পেছনে প্রাকৃতিক নিয়মের বিশাল প্রভাব রয়েছে এটা জেনে দাবি করেছিলেন নিজেদের ইচ্ছামত ভবিষ্যৎ সাজানোর। এই ভবিষ্যত সাজানোর কাজে বংশগতির ধারার প্রত্যক্ষ প্রভাব আমলে নিয়ে একটা বৈজ্ঞানিক ধারণার জন্ম দিয়ে তার অপব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি। তার এই বিজ্ঞানবেশী বর্ণবাদ সে সময় অনেক ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি জার্মানিতে এই ভয়ংকর ব্যাপারই তার চূড়ান্ত ধাপে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

জার্মান সেনানায়ক হিটলার গ্যাল্টনের সেই ইউজেনিক্স মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন বংশগতীয়ভাবে যারা বিশুদ্ধ জার্মানদের সমকক্ষ হতে পারবে না তাদের জার্মান ভূখণ্ড থেকে নির্মূল করে দিতে হবে। তবে এক পর্যায়ে এসে বর্ণবাদের এই ধারা থেকে পৃথিবীর মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। সবাই বর্ণ বা গোত্রের বিভাজনকে জীববিজ্ঞানে গুরুত্ব দেয়া বন্ধ করে। এক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল মানুষকে একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। মনুষ্য প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম হোমো স্যাপিয়েন্স দিয়েছিলেন শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যার জনক কারোলাস লিনিয়াস। পরে হোমো স্যাপিয়েন্সের আক্ষরিক অর্থ করা হয় বিজ্ঞ মানুষ। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক ইউভাল নোয়াহ হারারি মানুষকে নিয়ে লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত বই 'স্যাপিয়েন্স-এ ব্রিফ হিস্টরি অব হিউম্যানকইন্ড'। তিনি অন্য প্রাণি থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে বিশেষ বুদ্ধিমত্তা নিয়ে মানুষের বেড়ে ওঠার নানা দিক বর্ণনা করেছেন তাঁর এই গ্রন্থে।

পাঠ-৯.৪ বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব

বিশ শতকের দিকে এক্স বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপকতা পায়। তখন বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে জোরদার হয়ে ওঠে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন নেতা। তাঁরা জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে। এক্ষেত্রে ভারতের মহাত্মা গান্ধী, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, ডেসমন্ড টুটু, আমেরিকার মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র প্রমুখের নাম বলা যেতে পারে। এর মধ্যে কিংবদন্তী রাষ্ট্রনায়ক নেলসন ম্যান্ডেলা ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, যিনি বর্ণবাদের অবসান ঘটিয়ে বহু বর্ণভিত্তিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যাক্তিত্ব, প্রখর রসবোধ এবং প্রতিপক্ষের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়ার মত বিশাল মন বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনকে পথ দেখায়। তিনি তাঁর এসব গুনের জোরেই বিশ্বের জনপ্রিয় এবং আকর্ষণীয় নেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন । বর্ণবাদের অবসানের পর ১৯৯৪ সালের ১০ই মে নতুন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। এর মাত্র এক দশক আগেও সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকায় এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ছিল এক অকল্পনীয় ঘটনা। এই পরিবর্তনের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। শুধু দক্ষিণ আফ্রিকায় নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায়ও তিনি ভূমিকা রাখেন। বিশ্বের নানা দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন সফল করার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯৩ সালে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ।

১৯১৮ সালে নেলসন ম্যান্ডেলার জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন ইস্টার্ন কেপ প্রদেশের থেম্বো রাজকীয় পরিবারের কাউন্সিলর। দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যান্ডেলা তার গোত্রের দেয়া 'মাদিবা' নামে বিশ্বব্যাপী বেশি পরিচিত। এই সফল আন্দোলনের নেতা ও কিংবদন্তীর রাষ্ট্রনায়কের শৈশব কেটেছিল তার নানাবাড়িতে। তিনিই তাঁর পরিবাবের প্রথম সদস্য যিনি কোনা স্কুলে গিয়ে পড়ালেখার সুযোগ পেয়েছেন। স্কুলে পড়ার সময় একজন শিক্ষিকা ইংরেজিতে তাঁর নাম রাখেন 'নেলসন'। স্কুল পাস করার পর ম্যান্ডেলা ফোর্ট হেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাচেলর অফ আর্টস কোর্সে ভর্তি হন। এখানে অধ্যয়নরত অবস্থায় অলিভার টাম্বোর সাথে তার পরিচয় হয়। এই টাম্বো আর ম্যান্ডেলা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ম্যান্ডেলার আরেক বন্ধু ছিলেন ট্রান্সকেইয়ের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কাইজার মাটানজিমা। এই বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদেই পরবর্তীকালে ম্যান্ডেলা বান্টুস্থানের রাজনীতি ও নীতিনির্ধারণে জড়িত হয়েছিলেন। তবে একটা পর্যায়ে এসব নীতিমালার কারণেই ম্যান্ডেলা ও মাটানজিমার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল।

ম্যান্ডেলা তাঁর শিক্ষাজীবনের এক পর্যায়ে এসে ফোর্ট হেয়ার ছাড়েন। এরপর অল্পদিন পরে জানতে পারেন, জোঙ্গিন্তাবা তাঁর সন্তান জাস্টিস এবং ম্যান্ডেলার বিয়ে ঠিক করার ঘোষণা দিয়েছেন। ম্যান্ডেলা ও জাস্টিস এভাবে বিয়ে করতে রাজি ছিলেননা। তাই তাঁরা দুজনে জোহানেসবার্গে চলে যান। সেখানে যাওয়ার পর ম্যান্ডেলা শুরুতে একটি খনিতে প্রহরী হিসেবে কাজ নেন। তবে অল্পদিন পরেই খনির মালিক জেনে যান যে, ম্যান্ডেলা বিয়ে এড়াতে জোঙ্গিন্তাবার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছেন। এটা জানার পর খনি কর্তৃপক্ষ ম্যান্ডেলাকে ছাঁটাই করেন। পরবর্তীকালে ম্যান্ডেলা জোহানেসবার্গের আইনি প্রতিষ্ঠান উইটকিন, সিডেলস্কি অ্যান্ড এডেলম্যানে কেরানি হিসেবে যোগ দেন। ম্যান্ডেলার বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী ওয়াল্টার সিসুলু এই চাকরি পেতে ম্যান্ডেলাকে সাহায্য করেছিলেন।

এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সময়েই ম্যান্ডেলা ইউনিভার্সিটি অব সাউথ আফ্রিকার দূরশিক্ষণ কার্যক্রমের অধীনে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এর পরে ম্যান্ডেলা ইউনিভার্সিটি অব উইটওয়াটার্সব্রান্ডে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ শুরু করেন। এ পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে জো স্লোভো, হ্যারি শোয়ার্জ এবং রুথ ফার্স্টের পরিচয় হয়। পরবর্তীতে তাঁরা বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী হিসেবে অংশ নেয়ার কথা জানা গেছে। তবে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকার কথা দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯৪৮ সালের নির্বাচন। এ নির্বাচনে আফ্রিকানদের দল ন্যাশনাল পার্টি জয়লাভ করলেও দলটি বর্ণবাদে বিশ্বাসী ছিল এবং বিভিন্ন জাতিকে আলাদা করে রাখার চেষ্টা চালায়। তবে এই ন্যাশনাল পার্টির ক্ষমতায় আসার প্রেক্ষাপটে ম্যান্ডেলা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার পাশাপাশি ১৯৫৫ সালের জন সম্মেলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

রাজনৈতিক জীবনের প্রথমভাগে ম্যান্ডেলা মহাত্মা গান্ধির দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশেষ সফলতার মুখ দেখেননি। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী কর্মীদের নিয়ে প্রথম দিকে গান্ধির অহিংস আন্দোলনের নীতিকে গ্রহণ করে বর্ণবাদের

বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি প্রথম থেকেই অহিংস আন্দোলনের পক্ষপাতী থাকলেও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ সরকার ১৯৫৬ সালের ৫ ডিসেম্বর ম্যান্ডেলাসহ ১৫০ জন বর্ণবাদবিরোধী কর্মীকে দেশদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেফতার করেছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ ৫ বছর ধরে (১৯৫৬-১৯৬১) এই মামলা চললেও সব আসামি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন। এরপর ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ম্যান্ডেলা এএনসি-র সশস্ত্র অঙ্গসংগঠন উমখোন্তো উই সিযওয়েতে প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন এই সংগঠনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা। বর্ণবাদী সরকার ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতী ও চোরাগোপ্তা হামলা পরিকল্পনা ও সমন্বয় করেছিলেন তিনি। এসময় সেখানকার বর্ণবাদী সরকার পিছু না-হটলে প্রয়োজনবোধে গেরিলা যুদ্ধে যাওয়ার জন্যও ম্যান্ডেলা পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি বিদেশে এমকে-র জন্য অর্থ সংগ্রহ ও সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের কাজ শুরু করেন। প্রায় ১৭ মাস ধরে ফেরারি থাকার পর ১৯৬২ সালের ৫ আগস্ট ম্যান্ডেলাকে গ্রেপ্তার করে জোহানেসবার্গের দুর্গে আটক রাখা হয়।

অনেকে মনে করেন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ম্যান্ডেলার গতিবিধি ও ছদ্মবেশ সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার নিরাপত্তা পুলিশকে জানিয়ে দেয়াতেই তিনি তখন ধরা পড়েছিলেন। গ্রেফতারের পর শ্রমিক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়া এবং বেআইনিভাবে দেশের বাইরে যাওয়ার অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। ১৯৬২ সালের ২৫ অক্টোবর ম্যান্ডেলাকে এই দুই অভিযোগে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। এর দু-বছর পর ১৯৬৪ সালের ১১ জুন ম্যান্ডেলার বিরুদ্ধে এএনসি-র সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্বদানের অভিযোগ এনে শাস্তি দেওয়া হয়। তারপর থেকে ম্যান্ডেলার কারাবাস শুরু হয় রেবন দ্বীপের কারাগারে। তিনি তাঁর ২৭ বছরের কারাবাসের প্রথম ১৮ বছর কাটিয়েছিলেন এখানেই। তবে জেলে থাকার সময়ে বিশ্বজুড়ে সুনাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে তাঁর। দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃষ্ণাঙ্গ নেতা হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন তিনি। সশ্রম কারাদণ্ডের অংশ হিসেবে রেবন দ্বীপের কারাগারে ম্যান্ডেলা ও তাঁর সহবন্দিরা একটি চুনাপাথরের খনিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হন। তাকে আটক রাখা সেই কারাগারের অবস্থা ছিল বেশ শোচনীয়। সেই কারাগারেও বর্ণভেদ প্রথা চালু ছিলো। কৃষ্ণাঙ্গ বন্দিদের সবচেয়ে কম খাবার দেয়া হত। সাধারণ অপরাধীদের থেকে রাজনৈতিক বন্দিদের আলাদা রাখা হত। তবে রাজনৈতিক বন্দিরা সাধারণ অপরাধীদের চেয়েও অনেক কম সুযোগসুবিধা পেত। তার পরেও কারাগারে থাকার সময়ে ম্যান্ডেলা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় পড়ালেখা চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি এই কারাগারে থেকেই আইনে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীকালে ১৯৮১ সালে তাঁকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। তবে তিনি প্রিন্সেস অ্যানের কাছে সেই নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন।

দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের এক পর্যায়ে এসে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকার তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসেরসহ অন্যান্য বর্ণবাদবিরোধী সংগঠনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে তিনি ঘোষণা করেন, ম্যান্ডেলার মুক্তিদানের কথা। ভিক্টর ভার্স্টার কারাগার থেকে ম্যান্ডেলাকে ১৯৯০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেওয়া হয়। কারামুক্তির পর তিনি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত তিনিই এই দলের নেতা ছিলেন। এই সময়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ অবসানের লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তাঁর উদ্যোগে সংঘটিত এ শান্তি আলোচনা ফলপ্রসূ হওয়ার পর ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সব বর্ণের মানুষের অংশগ্রহণে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় অবদান রাখার জন্য ম্যান্ডেলা এবং রাষ্ট্রপতি এফ ডব্লু ডি ক্লার্ককে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়া হয়। ২০১৩ সালের ৮ জুন তিনি ফুসফুসে সংক্রমণের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরবর্তী ছয় সপ্তাহ তিনি হাসপাতালেই কাটান। ২০১৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর ম্যান্ডেলাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। ২০১৩ সালের ৫ ডিসেম্বর নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বর্ণবাদ বিরোধী এই নেতা।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রথমেই বলতে হয় মহাত্মা গান্ধির নাম। তাঁর নেতৃত্ব আর দর্শন পাল্টে দিয়েছিল গোটা দুনিয়াকে। তাঁর চেষ্টাতেই ভারতবর্ষের বিভ্রান্ত মানুষ খুঁজে পেয়েছিল স্বাধীনতার স্বাদ। তার জীবনাচরণ, আদর্শ ও নীতিগত দিক পথ দেখিয়েছে অনেক মানুষকে। তিনি গহীন অন্ধকারে এসেছিলেন আলোর মশাল নিয়ে। তিনি মানুষকে শিখিয়েছিলেন কিভাবে নতুন করে ভাবতে হয় এবং নিজেদের অধিকার আদায় করতে হয় এই মন্ত্র। গান্ধীর বাবা ছিলেন পোরবন্দরের দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী করমচাঁদ। করমচাঁদের চতুর্থ স্ত্রী পুতলিবার গর্ভে জন্ম নেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। মা প্রণামী বৈষ্ণব গোষ্ঠীর ছিলেন। মা প্রণামীর প্রভাবে গান্ধী তাঁর শৈশব থেকে জীবের প্রতি অহিংসা,

নিরামিষভোজন, আত্মশুদ্ধির জন্য উপবাসে থাকা, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ইত্যাদি বিষয় আয়ত্ব করেছিলেন। ১৮৮৩ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে মহাত্মা গান্ধী বাবা মায়ের পছন্দে কস্তুরবা মাখাঞ্জীকে বিয়ে করেন। এই দম্পতির চার ছেলে হরিলাল গান্ধী, মনিলাল গান্ধী, রামদাস গান্ধী এবং দেবদাস গান্ধীর জন্ম হয়।

করমচাঁদ গান্ধীর ছাত্রজীবনের অনেকটা সময় কাটে পোরবন্দর ও রাজকোটে। শিক্ষার্থী হিসেবে অতটা মেধার না হওয়ায় গুজরাটের ভবনগরের সামালদাস কলেজ থেকে নামমাত্র ফল নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮ বছর বয়সে ১৮৮৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে চলে যান। রাজকীয় রাজধানী লন্ডনে তাঁর জীবন-যাপন ছিল ভারতে থাকতে তাঁর মায়ের কাছে করা শপথ প্রভাবিত। বলে রাখা ভাল যে জৈন সন্ন্যাসী বেচার্জির সামনে তিনি তাঁর মায়ের কাছে শপথ করেছিলেন যে, তিনি মাংস, মদ এবং উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ করার হিন্দু নৈতিক উপদেশ পালন করবেন। তবে তিনি নিজেকে কোনো গুণের চর্চা থেকে বিরত রাখেননি। ব্যারিস্টারি পড়ার পাশাপাশি নাচের শিক্ষায় নিজেকে পারদর্শী করেন। তখনকার সময়ে লন্ডনের গুটিকয়েক নিরামিষভোজি খাবারের দোকানের একটিতে নিয়মিত যেতেন। আমিষভোজি প্রতিবেশীদের দেওয়া খাবার পর্যন্ত এড়িয়ে যেতেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ও কৃষ্ণাঙ্গ বৈষম্যের শিকার হলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন মহাত্মা গান্ধি। শুধুমাত্র বর্ণবাদী আচরণের কারণে একদিন তাঁকে পিটার মরিসবার্গের একটি ট্রেনের প্রথম শ্রেণির কামরা থেকে তৃতীয় শ্রেণির কামরায় যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। একইভাবে স্টেজকোচে ভ্রমণের সময় একজন চালক তাকে ধরে পিটিয়েছিল। কারণ একটাই তিনি এক ইউরোপীয় যাত্রীকে জায়গা দিতে ফুট বোর্ডে চড়তে রাজি হননি। যাত্রাপথে তাকে আরও কষ্ট করতে হয়েছিল। একবার একটা হোটেল থেকেও বহিষ্কার করা হয় তাকে। এই ঘটনাগুলো ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্ণবাদ, কুসংস্কার এবং অবিচার দূরীকরণের আন্দোলনে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ভোটাধিকার ছিল না। এই অধিকার আদায়ের বিল উত্থাপনের জন্য তিনি আরও কিছুদিন দেশটিতে থেকে যান। বিলের উদ্দেশ্য সাধন না হলেও এই আন্দোলন সেদেশের ভারতীয়দের অধিকার সচেতন করে তুলেছিল। ১৮৯৪ সালে গান্ধী 'নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে সেখানকার ভারতীয়দের রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হন। তারপর ১৮৯৭ সালের জানুয়ারিতে ভারতে এক সংক্ষিপ্ত সফর শেষে ফিরে আসার পর এক শ্বেতাঙ্গ মব তাকে হত্যার চেষ্টা করে। তার পরও গান্ধী তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন কারও ব্যক্তিগত ভুলের জন্য পুরো দলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়াটা ঠিক নয়। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই অহিংসাবাদী নেতাকে ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি গুলি করে হত্যা করা হয়। তখন তিনি নয়াদিল্লিতে পথসভা করছিলেন। তাঁর হত্যাকারী নাথুরাম গডসে ছিলেন একজন হিন্দু মৌলবাদী। নাথুরামের সঙ্গে চরমপন্থি হিন্দু মহাসভার যোগাযোগ ছিল। গডসে এবং সহায়তাকারী নারায়ণ আপতেকে পরবর্তীতে আইনের আওতায় এনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ১৯৪৯ সালের ১৪ নভেম্বর শাস্তি কার্যকরের উদ্দেশ্যে তাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

সারাংশ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বর্ণবাদ সেই নিকৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, চর্চা এবং ক্রিয়াকলাপ যেখানে বিশ্বাস করা হয় মানুষ বৈজ্ঞানিকভাবে অনেকগুলো গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং একই সাথে বিশ্বাস করা হয় কোন কোন গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর চেয়ে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য উঁচু অথবা নিচু। এখানে তার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারও নির্দিষ্ট করা হয় গাত্রবর্ণ দিয়ে। পাশাপাশি বেশি যোগ্য কিংবা অযোগ্য হওয়ার মানদণ্ডও এখানে গ্রোথিত। তবে বর্ণবাদের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কঠিন। গবেষকদের মধ্যে এই গোষ্ঠী ধারণা নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। এই বর্ণবাদের ধারণা কখোনো গায়ের চামড়ার রং দিয়ে হতে পারে, অন্যদিকে কখোনো আঞ্চলিকতার উপর ভিত্তি করেও হতে পারে। বিশ্বের বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে পথিকৃত নেতৃত্ব হিসেবে বলা যেতে পারে মহাত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা, ডেসমন্ড টুটু এবং মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের নাম।